জানুয়ারী-মার্চ ২০১৪ ৩য় পর্ব, ১ম সংখ্যা ISSN 2222-5188

ইনফো

মেডিকাস

চিকিৎসা সাময়িকী

- বিশেষ প্রবন্ধ
- ছবি দেখে রোগ নির্ণয়
- জরুরী চিকিৎসা
- রোগ ও চিকিৎসা

সূচী

বিশেষ প্রবন্ধ	৩
ছবি দেখে রোগ নির্ণয়	৬
জরুরী চিকিৎসা	৭
স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য	৯
রোগ ও চিকিৎসা	১০
ইনফো কুইজ	১৫

সম্পাদক মণ্ডলী

এম মহিবুজ জামান
ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান
ডাঃ তারেক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
ডাঃ মোঃ রাসেল রায়হান
ডাঃ তারেক-আল-হোসাইন

প্রকাশনায়

মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট
এসিআই লিমিটেড
নভো টাওয়ার, ১০ম তলা
২৭০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮

ডিজাইন

ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন লিঃ
রোড # ১২৩, বাড়ী # ১৮এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ,

সর্বপ্রথমে এসিআই পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য রইলো ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। নববর্ষের প্রথম সংখ্যাটিকে আমরা নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য দিয়ে আপনাদের জন্য সাজিয়েছি। আশা করি এই সংখ্যার তথ্যগুলো আপনাদের উপকারে আসবে।

ডায়াবেটিস একটি সুপ্ত ঘাতক ব্যাধি কিন্তু আমাদের একটু সচেতনতা ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপন এ ব্যাধি থেকে আমাদের সুস্থ রাখতে পারে। এই সংখ্যার বিশেষ প্রবন্ধে ডায়াবেটিস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

ছবি দেখে রোগ নির্ণয় বিভাগে বরাবরের মতো এবারও কিছু শিক্ষণীয় ছবি সংযোজন করা হয়েছে যা আপনাদের প্রতিনিয়ত চিকিৎসা সেবা দানে সহায়তা করবে।

হাড় আমাদের দেহের কাঠামো তৈরি করে। এটি আমাদের দেহের মজবুত ও শক্তিশালী অঙ্গ। নানারকম দুর্ঘটনাজনিত কারণে হাড় ভেঙ্গে যায়, যা খুবই মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই জরুরী চিকিৎসা বিভাগে হাড় ভাঙ্গলে প্রাথমিকভাবে কি কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, তা উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমান সময়ের কিছু আলোচিত রোগ ও তার চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে এই সংখ্যার রোগ ও চিকিৎসা বিভাগকে সাজানো হয়েছে।

এছাড়াও প্রতিবারের মতো অন্যান্য নিয়মিত বিভাগগুলোকে পূর্বের ন্যায় আপনাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সর্বশেষে ইনফো মেডিকাস - এর মাধ্যমে আপনাদের সাথে আমাদের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছান্তে,

(ডা: এস. এম. সাইদুর রহমান)
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ম্যানেজার

ডায়াবেটিস

আমরা যে সব খাদ্য গ্রহন করি, তার শর্করা জাতীয় অংশ পরিপাকের পরে সিংহভাগ গ্লুকোজ হিসেবে রক্তে প্রবেশ করে। আর দেহ কোষগুলো প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদনের জন্য গ্লুকোজ গ্রহন করে। অধিকাংশ দেহকোষই এই গ্লুকোজ গ্রহনের জন্য ইনসুলিন নামক এক প্রকার হরমোনের উপর নির্ভরশীল। ডায়াবেটিস হল ইনসুলিনের সমস্যাজনিত রোগ। ইনসুলিন কম বা অকার্যকর হওয়ার জন্য কোষে গ্লুকোজের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়, যার ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়তি হয় এবং সামগ্রিক অবস্থাকে ডায়াবেটিস মেলাইটাস বলে। কারো রক্তে গ্লুকোজ সুনির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলেই তাকে ডায়াবেটিস রোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে একবার ডায়াবেটিস হলে সেটি সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হয় না। তবে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলেও মোটামুটি সুস্থ ভাবেই জীবন যাপন করা সম্ভব।

প্রকারভেদ

টাইপ ১ ডায়াবেটিস

যখন অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিন প্রস্তুতকারী কোষগুলো কোনও কারণে নষ্ট হয়ে যায় বা ঠিকমত কাজ না করে তখন তাকে টাইপ ১ ডায়াবেটিস বলা হয়। টাইপ ১ ডায়াবেটিস রোগীদের শরীরে অতি অল্প বা কোনও ইনসুলিনই তৈরি হয় না। তাই এদের সুস্থ ভাবে বাঁচার জন্য সারা জীবনই ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিতে হয়। টাইপ ১ ডায়াবেটিস সাধারণত শুরু হয় ২০ বছরের কম বয়সী মানুষদের, যদিও যেকোনও বয়সেই এটা হওয়া সম্ভব।

টাইপ ২ ডায়াবেটিস

টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীদের শরীরেও ইনসুলিন তৈরি হয়, কিন্তু হয় তা যথেষ্ট নয়, অথবা সেটি শরীরে ঠিকমত কাজ করে না। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত বেশীর ভাগ রোগীই টাইপ ২ ডায়াবেটিসে ভোগে। এটি সাধারণত ৪০ বছরের বেশি মানুষদের এবং যাদের ওজন বেশী তাদের হয়। কিন্তু বেশী ওজনের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যেও টাইপ ২ ডায়াবেটিস আজকাল দেখা যায়। ওজন কমিয়ে এবং খাওয়া দাওয়া নিয়ন্ত্রন করেও (যেমন- আলু, ভাত, মিষ্টি ইত্যাদি যথাসম্ভব বর্জন করে) অনেকেই তাদের ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে। যারা সেটা পারে না, তারা নিজের শরীরে উৎপাদিত ইনসুলিন ভালো ভাবে কাজ করানোর জন্য ঔষধ খেয়ে বা ইনসুলিন ইনজেকশন নিয়ে সুস্থ ভাবেই জীবন-যাপন করতে পারে।

জেস্টেশন্যাল ডায়াবেটিস বা গর্ভকালীন ডায়াবেটিস

সন্তান-সম্ভবা মায়েদের হরমোন তারতম্যের জন্য অনেক সময় ইনসুলিন ব্যবহার করার ক্ষমতা ব্যাহত হয়। একে জেস্টেশন্যাল ডায়াবেটিস বা গর্ভকালীন ডায়াবেটিস বলা হয়। সাধারণত প্রসবের পর এদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

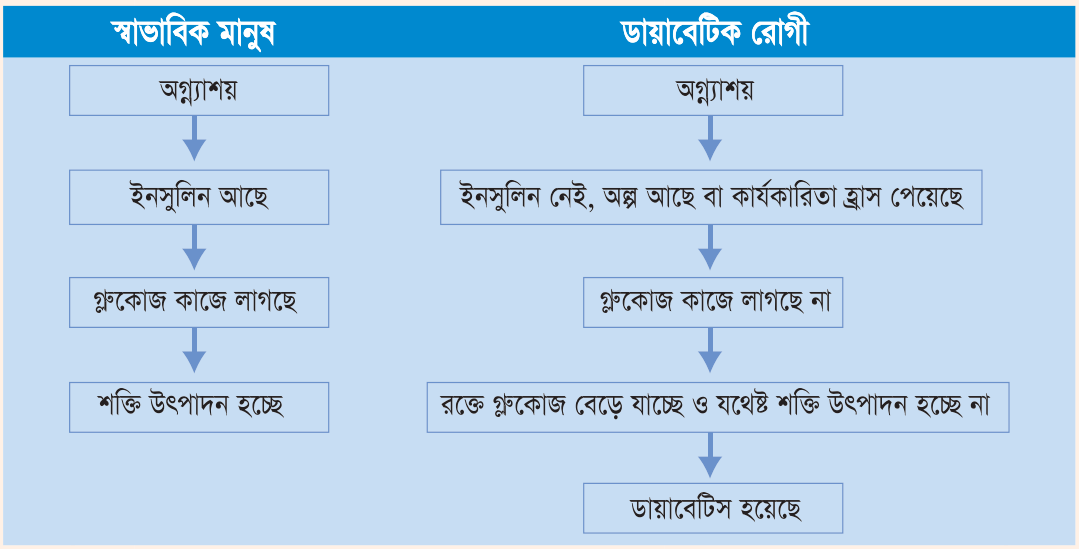

কাদের ডায়াবেটিস হতে পারে

- যাদের বংশে ডায়াবেটিস আছে।
- যাদের ওজন অনেক বেশী এবং যারা মেদবহুল।
- যাদের উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে।
- যাদের রক্তে কোলেস্টেরল বেশী।
- যারা ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করে না।
- তাছাড়া বয়সগত কারণেও ডায়াবেটিস হতে পারে।
- বহুদিন স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করলে।

লক্ষণসমূহ

টাইপ ১ ডায়াবেটিস এর লক্ষণসমূহ -

- ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া।
- খুব বেশী পিপাসা লাগা।
- বেশী ক্ষুধা পাওয়া।
- যথেষ্ট খাওয়া সত্ত্বেও ওজন কমে যাওয়া।
- ক্লান্তি বা দুর্বলতা বোধ করা।
- চোখে কম দেখা।
- তবে বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে অনেক সময় এ সব লক্ষণ প্রকাশ নাও পেতে পারে, তখন সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষাতেই ডায়াবেটিস ধরা পরে।

টাইপ ২ ডায়াবেটিস এর লক্ষণসমূহ -

টাইপ ১ ডায়াবেটিস এর লক্ষণসমূহের সাথে অন্যান্য অতিরিক্ত লক্ষণসমূহ। যেমন-

- ক্ষত শুকাতে বিলম্ব হওয়া।
- খোশ-পাঁচড়া, ফোঁড়া জাতীয় চর্মরোগ দেখা দেওয়া।
- চুলকানি হওয়া।

পরীক্ষা ও নিরীক্ষা

- রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা পরীক্ষা করা। যেমনঃ RBS, HbA_1C
- ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট (OGTT)
- প্রসাব পরীক্ষা করা। যেমনঃ Urine for Glucose, Ketones
- রক্তে চর্বির মাত্রা পরীক্ষা করা। যেমনঃ Serum Cholesterol, Triglycerides

ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট (OGTT) এর মাপকাঠি

রোগীর শ্রেণীবিভাগ	অভুক্ত অবস্থায়	৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ গ্রহন করার ২ ঘণ্টা পর
স্বাভাবিক	< ৬.১ মি.মোল/লি	< ৭.৮ মি.মোল/লি
আই জি টি (IGT)	৬.১ - < ৭.০ মি.মোল/লি	৭.৮ - < ১১.১ মি.মোল/লি
ডায়াবেটিস	≥ ৭.০০ মি.মোল/লি	> ১১.১ মি.মোল/লি

যেসব অবস্থায় ডায়াবেটিস প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে

- শারীরিক স্থূলতা।
- গর্ভাবস্থা।
- ক্ষত।
- আঘাত।
- অস্ত্রোপচার।
- মানসিক বিপর্যয়।
- রক্তনালীর অসুস্থতার কারণে হঠাৎ করে মস্তিষ্কের রোগ।
- বহুদিন স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করলে।

অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের কারণে যেসব অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে

- চোখ।
- স্নায়ু।
- কিডনী।
- পা।
- যৌন-ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া।
- হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা বেড়ে যায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখলে যেসব উপকার পাওয়া যায়

- সামগ্রিকভাবে ভাল বোধ করা।
- শরীর সুস্থ থাকা।

- প্রচুর প্রাণশক্তি পাওয়া যায়।
- বারবার প্রস্রাবের বেগ না হওয়া।
- প্রয়োজনের বেশী তৃষ্ণা না লাগা।
- শরীরের দুর্বল ভাব কমে যাওয়া।
- চোখ, কিডনী ও স্নায়ুর ক্ষতি এবং হৃদরোগ ও ফুসফুসসহ শরীরে জটিল যে কোন রোগ হবার আশংকা কমে যাওয়া।

চিকিৎসা

ডায়াবেটিস চিকিৎসার মূল উপাদান হলো

- শিক্ষা।
- সঠিক খাদ্যাভাস।
- ব্যায়াম।
- প্রয়োজনীয় ঔষধ।

উপোরোক্ত উপাদানগুলোর সমন্বয়ের জন্য ডায়াবেটিস স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমেই শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন যাপন প্রয়োজনীয়।

ডায়াবেটিসের ঔষধ ২ প্রকার

- খাবার বড়ি।
- ইনসুলিন।

খাবার বড়ির প্রকারভেদ

- ইনসুলিন নিঃসরণ বর্ধক। যেমনঃ গ্লিপিজাইড, গ্লিকাজাইড, রেপাগ্লিনাইড।
- ইনসুলিনের কার্যকারিতা বর্ধক। যেমনঃ মেটফরমিন।
- অন্ত্রের গ্লুকোজ শোষণ প্রতিরোধক। যেমনঃ একারবোজ।
- ইনসুলিন নিঃসরণ বর্ধক ও জীবকোষের রক্ষা করার জন্য সিটাগ্লিপ্টিন, ভিল্ডাগ্লিপ্টিন।

ইনসুলিনের প্রকারভেদ

- স্বচ্ছ, নিয়মিত বা স্বল্পমেয়াদী ইনসুলিন (Regular Insulin)
- ঘোলাটে বা মধ্যমেয়াদী ইনসুলিন (Intermediate Insulin)

প্রতিরোধ

পারিবারিকভাবে যাদের এ রোগ হবার ঝুঁকি আছে, তারা যদি খাদ্যভাস, শরীরের ওজন, শারীরিক পরিশ্রম বা নিয়মিত ব্যায়াম করে তাহলে তারা এ রোগের আক্রমণ থেকে বেঁচে যেতে পারে, কিংবা আক্রান্ত হলেও তার প্রকটতা তুলনামূলক কম হয়। যদি কেউ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়, তবে সঠিক ভাবে জীবন যাপন করলে অনেক ক্ষতিকারক দিক থেকে বেঁচে থাকা যায়।

জীবনযাত্রার পরিবর্তন

- ডায়াবেটিক রোগীদের সুস্থতার জন্য খাদ্যাভাস নিয়ন্ত্রণ করা।
- নিয়মিত ব্যায়াম করা।
- ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা।
- ধূমপান ও মাদকাসক্তি থেকে বিরত থাকা।

নিজের প্রতি যত্নবান হওয়া

- শরীরে কোন রকম ঘা যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা।
- বাসস্থান পরিচ্ছন্ন এবং জীবাণুমুক্ত রাখা।
- পায়ে চাপ পড়ে এমন জুতো না পরা।

উপদেশ

- নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃংখল জীবন যাপন করা।
- রক্তের গ্লুকোজ নির্ধারিত মাত্রার মধ্যে ধরে রাখাই ডায়াবেটিস চিকিৎসার মূল লক্ষ্য।
- প্রতিটি ডায়াবেটিস রোগীর জন্য সাধারণত আলাদা আলাদা ধরণের চিকিৎসাপত্র থাকে যাতে প্রতিটি রোগীই তার জন্য নির্ধারিত মাত্রার গ্লুকোজ রক্তে বজায় রাখতে পারে।
- নিয়মিত রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা পরীক্ষা এবং নিয়মিত ঔষধ সেবন করা।
- ডায়াবেটিস শনাক্ত হওয়া মাত্র দেরি না করে দ্রুত প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক গ্রহন করাই উত্তম।

ইনফো কুইজ উত্তর (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩)

১. ক) পায়ের রক্তবাহী নালির সমস্যা
২. ক) ক্ষতস্থান থেকে রক্ত না পড়া
৩. খ) উঁচু উঁচু ঘাস বা জঙ্গলের মধ্যে হাঁটাই শ্রেয়
৪. ঘ) পেটের MRI
৫. খ) যকৃতকে আক্রান্ত করে
৬. ঘ) উপরের সবগুলো
৭. খ) বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে অথবা বসে থাকলে ব্যথা অনুভূত না হওয়া
৮. ক) ঘরের মাঝে আলো বাতাস প্রবেশ করতে না দেয়া
৯. ক) সাধারণত ভেইন বা শিরার ভালব্ নষ্ট হয়ে যাবার কারণে স্ট্রোক হয়
   গ) স্ট্রোকে শতকরা ২০ ভাগই ইসকেমিক স্ট্রোক (সেরিব্রাল থ্রোমবোসিস অথবা অ্যামবোলিজম)
   ঘ) হৃৎপিণ্ডের কোষ রক্ত সরবরাহ না পেয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়াকেই স্ট্রোক বলা হয়
১০. ঘ) সবসময় সামনের দিকে ঝুঁকে কাজ করতে হবে এবং নরম গদি বা চেয়ারে বসতে হবে

ছবি দেখে রোগ নির্ণয়

অ্যাবসেস (Abscess)

অ্যালোপেসিয়া অ্যাঁরাটা (Alopecia aerata)

পেরিটনসিলার অ্যাবসেস (Peritonsilar abscess)

বোঁ নী (Bow knee)

লিম্ফ অ্যাঁডেনোপ্যাথি (Lymphadenopathy)

ক্ল্যাবিং (Clubbing)

সায়ানোসিস (Cyanosis)

লাইম ডিজিজ (Lyme disease)

স্কোলিওসিস (Scoliosis)

ধনুষ্টংকার (Tetanus)

রিষ্ট ড্রপ (Wrist drop)

কুশিং ফেস (Cushing face)

হাড় ভাঙ্গা

হাড় মানব শরীরের সবচেয়ে মজবুত ও শক্তিশালী অঙ্গ। শারীরিক গঠন, আকৃতি, স্পর্শকাতর অঙ্গের সুরক্ষা, জোড়ার নড়াচড়া ও দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থায় হাড়ের অবদান অপরিসীম। হাড়ের মজ্জা রক্ত ও রক্তকণিকা তৈরি করে, ক্যালসিয়াম মজুদ করে এবং প্রয়োজনে সরবরাহ করে। শরীরের ছোট বড় ২০৬টি হাড়ের প্রতিটিই কোলাজেন, শর্করা, আমিষ, পানি ও খনিজ লবণ দিয়ে তৈরি। ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য খনিজ লবণ হাড়ের গঠন মজবুত এবং শক্তিমত্তা বৃদ্ধি করে। যে হাড়গুলো চামড়ার কাছাকাছি থাকে তাদের ভেঙ্গে যাওয়ার প্রবণতা বেশি।

মানুষের জীবনের কোন না কোন সময় অন্তত একটি হাড় ভাঙ্গার প্রবণতা দেখা যায়। ছোটদের ও কিশোর বয়সে কবজির জোড়ার কাছে, নিম্নবাহুর হাড়, কনুইর কাছে, উরুর হাড় ও কটির হাড় ভাঙ্গে। হাড়ের আবরণ শক্ত বিধায় হাড়ের ভাঙ্গা টুকরোগুলো কাছাকাছি থাকে। আঘাতের কারণে বড়দের হাড় অধিকাংশ সময় কয়েক টুকরায় বিভক্ত হয়ে দূরে সরে যায়। সমীক্ষায় প্রতীয়মান, যে মহিলারা শারীরিক গঠনে পাতলা ও খাটো এবং বয়স্ক, তাদের পুরুষদের তুলনায় হাড় ভাঙ্গার প্রবণতা চারগুণ বেশি থাকে।

প্রকারভেদ

- ক্লোজড (সাধারণ) - ভাঙ্গা হাড়ের বাইরে চামড়া অক্ষত থাকলে তাকে ক্লোজড বা সাধারণ হাড় ভাঙ্গা বলে।
- ওপেন বা কম্পাউন্ড (যৌগিক) - হাড় ভাঙ্গার সঙ্গে চামড়া ও পেশি ক্ষত হলে একে ওপেন বা কম্পাউন্ড (যৌগিক) হাড় ভাঙ্গা বলে।
- গ্রিনস্টিক - হাড়ের মধ্যে চিড় বা ফাটল ধরলে একে গ্রিনস্টিক হাড় ভাঙ্গা বলে। সাধারণত বাচ্চাদের হাড়ের নমনীয়তার জন্য তাদের এটা বেশি দেখা যায়।
- হেয়ারলাইন - সাধারণত চাপের ফলে খুবই সুক্ষ্ম পরিমাণ হাড়ের চিড় ধরাকে হেয়ারলাইন হাড় ভাঙ্গা বলে। দৌড়ানোর সময় বারবার চাপের ফলে পায়ের পাতা বা পা-এ এটি দেখা যায়।
- কমপ্লিকেটেড (জটিলতম) - হাড় ভাঙ্গার সাথে সাথে যদি হাড়কে ঘিরে থাকা হাড়ের আস্তরণ (Periosteum), শিরা, ধমনী বা স্নায়ু ক্ষতি হয় তাহলে তাকে কমপ্লিকেটেড (জটিলতম) হাড় ভাঙ্গা বলে।
- কমিনিউটেড (চূর্ণ) - হাড় ভেঙ্গে ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হওয়াকে কমিনিউটেড (চূর্ণ) হাড় ভাঙ্গা বলে। এ ধরণের হাড় ভাঙ্গা ভালো হতে অনেক সময় লাগে।
- এভালসন - এ ধরণের হাড় ভাঙ্গার ক্ষেত্রে পেশী দ্বারা ভাঙ্গা হাড়টি ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। পেশীর শক্তিশালী সংকোচনের ফলে হাড়ের কিছু অংশ তার অবস্থান থেকে উঠে আসে। হাঁটু এবং কাঁধের অস্থিসন্ধিগুলোতে এই ধরণের ভাঙ্গা বেশি দেখা যায়।
- কমপ্রেশণ (সংকোচন) - দুইটি হাড়ের মধ্যকালীন ঘর্ষণের ফলে এই ধরণের ভাঙ্গা পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত মেরুদণ্ডের হাড়-এ এটি দেখা যায়। বয়স্ক লোকেরা যারা অস্টিওপরোসিস রোগে ভোগে তাদের মধ্যে এ ধরণের হাড় ভাঙ্গার প্রবণতা বেশি দেখা দেয়।

কারণসমূহ

- আঘাতজনিত কারণ যেমন খেলাধুলা জনিত আঘাত, সড়ক দুর্ঘটনা জনিত আঘাত ও উপর থেকে পড়ে গেলে হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে।
- আঘাত ছাড়াও বিভিন্ন রোগের কারণে হাড় ভাঙ্গতে পারে। বয়স্কদের হাড়ের ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য উপাদান কমে যায় বলে অল্প আঘাতেই বা আপনা-আপনি হাড় ভেঙ্গে যায়। কবজির জোড়ার হাড়, কটির জোড়ার হাড় ও মেরুদণ্ডের হাড়ের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। হাড়ের টিউমার ও ক্যান্সার, ইনফেকশন (সেপটিক ও টিবি), ওসটিওপোরোসিস, ওসটিওমালাসিয়া, ওসটিওপেটরোসিস, এন্ডোক্রাইন গ্রন্থির (পিটুইটারি, থাইরয়েড, এডরেনাল ও গোনাড) সমস্যা এবং আর্থারাইটিস (রিউমাটয়েড ও অসটিওআর্থারাইটিস) রোগীরা হাড় ভাঙ্গায় বেশি আক্রান্ত হয়।
- ধূমপান ও মদ্যপান, স্টেরয়েড ও এন্টিকনভ্যালসেন্ট ড্রাগ সেবনকারী এবং হেপারিন থেরাপি পাওয়া লোকদের অল্প আঘাতেই হাড় ভেঙ্গে যায়।
- এছাড়াও যক্ষ্মা, খাদ্যনালীর রোগ, যকৃতের রোগ এবং খাদ্যনালী ও জরায়ুর অপারেশন হাড় ভাঙ্গার প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়।

লক্ষণসমূহ

হাড় ভাঙ্গার লক্ষণসমূহ নানারকম হতে পারে। এগুলো নির্ভর করে কোন অংশের হাড় ভেঙ্গেছে বা কতটুকু অংশ আঘাত পেয়েছে তার উপর। হাড়ের বাইরের অংশ ভাঙ্গার সাথে সাথে বাইরের জোড়ারও স্থানচ্যুতি হতে পারে। তবে সাধারণত যেকোনো হাড় ভাঙ্গার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ পরিলক্ষিত হয়-

- হাড় ভাঙ্গার ও স্থানচ্যুতির ফলে রোগী প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করে।
- আক্রান্ত জায়গা ফুলে যায়।
- চামড়ার রং পরিবর্তন হয়।
- হাত-পা নাড়াচাড়া করলে ব্যথা বেড়ে যায় এবং হাত দিয়ে কিছু তোলা বা চলাচল কষ্টকর হয়।
- আবার রক্তনালী ও স্নায়ু আক্রান্ত হলে হাত বা পা-এ তীব্র ব্যথা ও অবশ ভাব হয়।

পরীক্ষা ও নিরীক্ষা

- এক্স-রে (X-ray)
- সি.টি স্ক্যান (CT scan)
- এম.আর.আই (MRI)
- রক্ত পরীক্ষা করা। যেমনঃ CBC, RBS

চিকিৎসা

আঘাত বা যে কোন কারণেই হাড় ভাঙ্গলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। হাড় ভাঙ্গার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক কারণেরও চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। আক্রান্ত অংশের এক্স-রে করে সহজেই হাড় ভাঙ্গা নির্ণয় করা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সঠিকভাবে হাড় ভাঙ্গার আকৃতি নির্ণয় করতে এবং প্রাথমিক কারণ জানতে সি.টি স্ক্যান, এম.আর.আই-এর সাহায্য নিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে হাড় ভাঙ্গার সঙ্গে জোড়ার স্থানচ্যুতি এবং রক্তনালী ও স্নায়ু ইনজুরি থাকলে অপারেশন-এর প্রয়োজনীয়তা হয় সেক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে। কোন হাড় ভাঙ্গা রোগীর ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে যা যা করণীয়-

- রোগীর ভাঙ্গা হাড়কে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে যাতে পেশীর ক্ষত কম হয়।
- বরফের টুকরো টাওয়ালে নিয়ে বা ঠান্ডা পানি ইলাস্টিক ব্যাগে নিয়ে লাগালে ব্যথা ও ফুলা কমে আসবে।
- আক্রান্ত অংশে প্লাস্টার বা স্পিলিন্ট ব্যবহারে ফুলা ও ব্যথা কমে আসে।
- ওপেন বা কম্পাউন্ড হাড় ভাঙ্গা হলে বিশুদ্ধ গজ ব্যান্ডেজ বা কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রাখতে হবে যাতে রক্তক্ষরণ কম হয়।
- এনালজেসিক বা ব্যথানাশক ঔষধ সেবনে ব্যথা নিরাময় হবে।
- কম্পাউন্ড হাড় ভাঙ্গা হলে এন্টিবায়োটিক, টিটেনাস টক্সয়েড ও টিটেনাস ইমিউনোগ্লোবিউলিন, স্যালাইন এবং প্রয়োজনে শরীরে রক্ত সঞ্চালন করতে হবে।

রোগীকে উল্লেখিত প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাড় ভাঙ্গার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। হাড়ের বিভিন্ন উপাদানের ক্ষয় পূরণের জন্য পরিমিত ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি ও বিসফসফোনেট সেবন, হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি এবং রেলোক্সিফেন ও ক্যালসিটোনিন ইনজেকশনের প্রয়োজন হতে পারে।

জটিলতাসমূহ

- অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ।
- হাড় সংলগ্ন অঙ্গ, কলা বা হাড়কে ঘিরে থাকা হাড়ের আস্তরণ (Periosteum), অস্থিসন্ধি, শিরা, ধমনী বা স্নায়ুর ক্ষতিসাধন।
- বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হাড়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান।
- হাড় ভাঙ্গা জোড়া লাগতে দেরী হওয়া।
- হাত-পা এর সাময়িক বা চিরস্থায়ী অবশ হওয়া।
- আজীবন পঙ্গুত্ব বরণ।

প্রতিরোধ

চলাফেরা ও ভ্রমণের সময় যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করলে দুর্ঘটনা থেকে অনেকটা রেহাই পাওয়া যায়। খেলাধুলার আগে পরে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং খেলার সময় সর্তকতা ও উপযুক্ত কলাকৌশলে হাড়ভাঙ্গা থেকে মুক্ত থাকা যায়। উপযুক্ত ব্যায়াম যেমন নিয়মিত হাঁটা, সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা এবং ওজন বহন করা হাড়কে মজবুত ও শক্তিশালী করে। কিশোর বয়সে কায়িক পরিশ্রম করলে হাড়ের ক্যালসিয়াম ও মিনারেল-এর পরিমাণ বেড়ে যায় এবং হাড় বৃদ্ধি পায়। ফলে বৃদ্ধ বয়সে হাড় কম ভাঙ্গে। সুষম খাদ্য এবং কিশোর বয়সে ১৩০০ মিলি গ্রাম, ৫০ বছর পর্যন্ত ১০০০ মিলি গ্রাম এবং ৫০ বছরের উর্ধ্বে ১২০০ মিলি গ্রাম ক্যালসিয়াম দৈনিক সেবন করা উচিত। ধূমপান ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকা উচিত।

স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য

ঔষধে অ্যালার্জি

সব ঔষধের কমবেশি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে, কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ ঔষধ বা রাসায়নিকের প্রতি ব্যক্তিবিশেষের থাকতে পারে অতিসংবেদনশীলতা। যার ফলে দেখা দিতে পারে গুরুতর অ্যালার্জি। কখনো কখনো এ থেকে জীবন বিপন্নও হতে পারে।

ঝুঁকিপূর্ণ ঔষধসমূহ

পেনিসিলিন ও সেফালোস্পোরিন জাতীয় এন্টিবায়োটিক, সালফারযুক্ত ঔষধ, ভ্যাকসিন, এলুপিউরিনল, উচ্চ রক্তচাপের কিছু ঔষধ যেমন- এসিই ইনহিবিটর, কিছু খিঁচুনি প্রতিরোধক ঔষধ ইত্যাদিতে সাধারণত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশি ঘটে। তবে ব্যক্তিবিশেষের ওপর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার তীব্রতা নির্ভর করে।

কারণসমূহ

- কোনো ধরনের একটি ঔষধে আগে যদি কারও অ্যালার্জি হয়ে থাকে, তবে একই শ্রেণীর বা কাছাকাছি রাসায়নিক গড়নের অন্য ঔষধ ব্যবহারে অ্যালার্জির ঝুঁকি থাকে।
- কিছু ঔষধ যেমন- পেনিসিলিনে অ্যালার্জির পারিবারিক ইতিহাস থাকতে পারে।
- স্বল্প সময়ে একই ঔষধ বারবার ব্যবহার অ্যালার্জির ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

লক্ষণসমূহ

- ত্বকে লালচে দানা, চুলকানি, ত্বক চাকা চাকা হয়ে ওঠা।
- শ্বাসকষ্ট, মুখ-গলা ফুলে যাওয়া।
- জ্বর বা কাঁপুনি হওয়া।
- সবচেয়ে গুরুতর ধরনের অ্যালার্জিতে ত্বক, মুখগহ্বর ও অন্যান্য স্থানে ফোসকা বা ঘা হওয়া।

প্রতিরোধ

কোনো ঔষধে অ্যালার্জি হয়ে থাকলে তার নাম সংরক্ষণ করা। একই শ্রেণীভুক্ত বা কাছাকাছি শ্রেণীর ঔষধ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা। কোনো এন্টিবায়োটিক বা ঔষধ সেবনের পর চুলকানি দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ করে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

রক্তদান

সুস্থ মানুষের কেজি প্রতি ৫০ মি.লি. রক্ত প্রয়োজন হয়। কিন্তু গড়ে পুরুষের শরীরে কেজি প্রতি ৭৬ মি.লি. এবং নারীর ৬৬ মি.লি. রক্ত থাকে। এই উদ্বৃত্ত রক্ত দান করলে কোন ক্ষতি হয় না, বরং তা অন্যের জীবন বাঁচাতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক যে কেউ তিন থেকে চার মাস অন্তর রক্ত দিতে পারেন।

রক্ত দানের পূর্বে রক্ত দাতার রক্তে এইচআইভি, হেপাটাইটিস, সিফিলিস, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি জীবাণু আছে কিনা পরীক্ষা করে নিতে হয়।

রক্ত দেয়ার প্রয়োজনীয়তা

দেহের কোষগুলোয় অক্সিজেনসহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদান পৌঁছে দেয়া, কার্বন ডাই অক্সাইডসহ অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ, রোগজীবাণু ধ্বংস করা, শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখা, ইত্যাদি কাজে রক্ত অতি আবশ্যক। বড় ধরনের অপারেশন বা দুর্ঘটনায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে কিংবা অগ্নিদগ্ধ রোগীর চিকিৎসায় রক্ত প্রয়োজন হয়। এছাড়া প্রসূতি ও নবজাতকের বিভিন্ন জটিলতায় রক্ত প্রয়োজন হতে পারে। রক্তাল্পতা, ক্যান্সার, থ্যালাসেমিয়া, হিমোফিলিয়াসহ বিভিন্ন রোগে রক্ত দেয়া প্রয়োজন হয়।

রক্ত দেয়ার উপকারিতা

রক্ত দিলে হৃদরোগ, হার্ট এট্যাক, ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের ঝুঁকি কমে। এছাড়া রক্ত দেয়ার সময় দাতার রক্তচাপ, পালস ইত্যাদি দেখার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় স্ক্রিনিং করার কারণে রক্তদাতা নিজের সুস্থতা সম্পর্কে আশ্বস্ত হতে পারে।

যারা রক্ত দিতে পারেন

- রক্তদাতার বয়স ১৮ থেকে ৬০ এর মধ্যে হতে হয়।
- ওজন অন্তত ৪৮ কেজি হতে হয়।
- রক্তদানের সময় রক্তদাতার শরীরের তাপমাত্রা ৯৯.৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের নিচে এবং নাড়ির গতি ৬০ থেকে ১০০ বার এর মধ্যে থাকতে হয়।
- ঔষধ ছাড়া সিস্টোলিক রক্তচাপ ১০০ থেকে ১৪০ পারদ চাপ এবং ডায়স্টোলিক রক্তচাপ ৬০ থেকে ১০০ পারদ চাপের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন।
- পুরুষের ক্ষেত্রে রক্তের হিমোগ্লোবিন ১২.৫ গ্রাম/১০০ এমএল এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১১.৫ গ্রাম/১০০ এমএল হওয়া দরকার।
- রক্তদাতাকে শ্বাসযন্ত্রের রোগ এবং চর্মরোগ মুক্ত থাকতে হয়। রক্তদাতার রক্ত পরিসঞ্চালন জনিত কোন রোগ আছে কিনা সেটাও দেখতে হয়।

বেলস পলসি

মানুষের শরীরে ১২ ধরণের ক্রেনিয়াল নার্ভ বা স্নায়ু আছে। এর মধ্যে সপ্তম ক্রেনিয়াল নার্ভের নাম ফেসিয়াল নার্ভ, যা মস্তিষ্ক থেকে তৈরি হয়ে, হাড়ের ভেতরে টানেলাকৃতি জায়গা পেরিয়ে কানের পেছন দিয়ে এসে মুখমণ্ডলে পাঁচটি শাখার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। মুখমণ্ডল, চোখের পাতা ও কপালের মাংসপেশির নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি এই স্নায়ু জিহ্বায় স্বাদের নিয়ন্ত্রণ ও অতিরিক্ত শব্দ কানে ঢুকতে বাধা দেয়। এই নার্ভের মাধ্যমেই মুখমণ্ডলের মাংসপেশি নড়াচড়ার মাধ্যমে সুন্দর হাসি বা বেদনার অভিব্যক্তি তৈরি করে। যদি কোনো কারণে প্রদাহের ফলে নার্ভটি ফুলে যায়, তখন টানেলের ভেতরে থাকা অংশ খুব চাপের মধ্যে পড়ে দুর্বল বা অকার্যকর হয়ে পড়ে, এর ফলে বেলস পলসি নামক রোগ দেখা দেয়।

কারণসমূহ

বেশির ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে এর কারণ জানতে পারা যায় না। তবে জ্বর, ঠান্ডা লাগা, সর্দি-কাশি, কান পাকা, ভাইরাস সংক্রান্ত প্রভৃতি কারণে নার্ভের প্রদাহ হয়ে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে ফেসিয়াল নার্ভ দুর্বল হওয়ায় এ রোগ হয়ে থাকে। কারণ হিসেবে প্রধানত হারপিস জোস্টার ভাইরাসকে চিন্তা করা হয়। এ ছাড়া মাথায় আঘাত লাগা, ডায়াবেটিস, ব্রেন টিউমার, ব্রেন স্টেম স্ট্রোক, মাল্টিপল স্কেলোরোসিস ইত্যাদি কারণেও একই রকম রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এ রোগ হওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

লক্ষণসমূহ

বেলস পলসি রোগের লক্ষণসমূহ হঠাৎ করেই শুরু হয়। রোগ শুরু হওয়া থেকে প্রথম ৪৮ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা দেখা যায়। এক কথায় এ রোগের অগ্রগতি আশাপ্রদ। সাধারণত ৮৫ শতাংশ রোগী তিন সপ্তাহের ভেতর ভালো হয়ে যায়। অবশিষ্ট রোগীর বেশির ভাগই আট সপ্তাহের মধ্যে উন্নতি লাভ করে। তবে প্রথম আট সপ্তাহের মধ্যে ভালো না হলে কিছু দুর্বলতা থেকে যায়। ১০ বছরের কম বয়সে ও ৬০ বছরের বেশি বয়সী রোগীদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি-

- রোগের পূর্ব লক্ষণ হিসেবে গা ম্যাজ ম্যাজ করা, খাবারে স্বাদ না পাওয়া, বমি বমি ভাব বা ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে।
- যে দিকের নার্ভ কাজ করে না, সেদিকের মুখ ও কপালের মাংসপেশি দুর্বল হয়ে যায়, চোখ বন্ধ হয় না এবং যেদিকে আক্রান্ত হয়, মুখমণ্ডল তার বিপরীতে বেঁকে যায়। দুর্বল দিক দিয়ে খাবার ও পানি মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ে।
- এ রোগ সাধারণত মুখমণ্ডলের এক দিকে আক্রান্ত হয়, কিন্তু ১ শতাংশ ক্ষেত্রে দুই দিকই আক্রান্ত হতে পারে।
- চোখ খোলা থাকে, চোখের পানি অনেক সময় শুকিয়ে যায়। এ কারণে চোখের ভেতরে ধুলা-বালি ঢুকে চোখের মণিতে বা কর্নিয়ায় প্রদাহ হতে পারে।
- অনেক সময় রোগী আক্রান্ত দিকের কানে বেশি শুনতে পায়, পাশাপাশি মুখমণ্ডল অবশ লাগা, শিরশির করা ও হালকা মাথাব্যথা থাকতে পারে। লক্ষণ দিয়েই মূলত রোগ নির্ণয় করা যায়। পরবর্তী সময় জিহ্বায় স্বাদ না পাওয়া ও মুখের মাংসপেশিতে খিঁচুনি হতে পারে। কোনো কোনো রোগীর খাবার চিবাতে গেলে চোখ দিয়ে পানি পড়ে। একে ক্রোকোডাইল টিয়ার সিনড্রোম বা কুমিরের কান্না বলা হয়।

পরীক্ষা ও নিরীক্ষা

- রক্তের CBC
- রক্তের RBS

চিকিৎসা

- চিকিৎসার জন্য মুখের ব্যায়াম করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ফিজিওথেরাপি দিলে এই রোগ হতে নিরাময় পাওয়া যায়।
- ঔষধের ভেতরে প্রেডনিসোলোন নামক স্টেরয়েড ব্যবহার করা যেতে পারে। স্টেরয়েড-জাতীয় ঔষধ প্রদাহ নিরাময়ে কিছুটা কার্যকর হলেও এন্টিভাইরাল ঔষধ খুব বেশি কার্যকর নয়।
- চোখের যত্নে চোখে ড্রপ দেওয়া, রাতে ঘুমানোর সময় চোখে মলম দিয়ে ব্যান্ডেজ করে রাখা এবং কালো চশমা ব্যবহার করতে বলতে হবে।
- মুখগহ্বরের যত্নের জন্য প্রতিবার খাওয়ার পর আঙুল দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে হবে এবং মাউথওয়াশ দিয়ে মুখ কুলকুচা করতে হবে। কোনো ইনফেকশন থাকলে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করার উপদেশ দিতে হবে।

কুষ্ঠরোগ

এটা একটি ক্রনিক রোগ যেটির মূলে রয়েছে *Mycobacterium leprae* নামে এক ধরণের জীবাণু। এই জীবাণু খুবই আস্তে আস্তে বংশবৃদ্ধি করে। তাই সংক্রমণ হওয়ার পরে অসুখটি আরম্ভ হতে প্রায় ২ বছর সময় লাগে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে ১২ বছরও লেগে যেতে পারে। এটি সংক্রামিত হয় হাঁচি, কাশির বা মুখ নিঃসৃত লালার মাধ্যমে। কুষ্ঠরোগ সাধারণত চামড়া, প্রান্তিক স্নায়ু ও শ্বসনতন্ত্রের উপরিভাগের শৈষ্মিক ঝিল্লীকে আক্রমণ করে। প্রায় ৯৫ ভাগ মানুষ এই রোগের প্রবণতা থেকে মুক্ত। বাকি ৫ ভাগ মানুষ যারা এই রোগে ভোগেন তাদের বেশির ভাগ কোষের মধ্যস্থিত ইমিউনিটি (Cell mediated immunity) এর অভাবে হয়ে থাকে। কুষ্ঠরোগ সাধারণত নিম্নের তিনটি উপায়ে শরীরের ক্ষতিসাধন করতে পারে-

- পেরিফেরাল নিউরাইটিস
- ব্যাসেলারি জীবাণুর অনুপ্রবেশ (Bacillary infiltration)
- একিউট লেপ্রা রিএকসন (Acute lepra reaction)

প্রকারভেদ

- মাল্টিব্যাসেলারি লেপ্রসি (Multibacillary leprosy)
- লেপ্রমেটাস লেপ্রসি (Leparomatous leprosy)
- বর্ডারলাইন লেপ্রমেটাস লেপ্রসি (Borderline Leparomatous leprosy)
- পাউসিব্যাসেলারি লেপ্রসি (Paucibacillary leprosy)
- ইন্টারমিডিয়েট লেপ্রসি (Intermediate leprosy)
- টিউবারকূলোএড লেপ্রসি (Tuberculoid leprosy)
- বর্ডারলাইন টিউবারকূলোএড লেপ্রসি (Borderline Tuberculoid leprosy)

সংক্রমণের পদ্ধতি

- সরাসরি সংক্রমণ (Direct contact)
- বায়ু বাহিত সংক্রমণ (Air-borne transmission)
- ড্রপলেট সংক্রমণ (Droplet infection)

লক্ষণসমূহ

মাল্টিব্যাসেলারি লেপ্রসি (Multibacillary leprosy)

- অসার দাগের সংখ্যা ৫-এর অধিক থাকা।
- এক বা একাধিক প্রান্তিক স্নায়ু স্ফিত হওয়া।
- শরীরের কোনো কোনো অংশে চামড়া মোটা হওয়া।
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরীরের নানা অংশে অসংখ্য দানা বা গুটি বের হওয়া।

পাউসিব্যাসেলারি লেপ্রসি (Paucibacillary leprosy)

- চামড়ার উপরে ১-৫ টি অসার দাগ (ফ্যাকাশে বা লালচে রঙের) থাকা। দাগগুলোতে চুলকানি না থাকা, দাগযুক্ত স্থানে অনেক সময়ে লোম উঠে যাওয়া এবং দাগের উপরিভাগে আঙুল দিলে খসখসে বোধ হওয়া।

- একাধিক প্রান্তিক স্নায়ু স্ফিত, ব্যথাযুক্ত কিংবা শক্ত হয়ে যাওয়া।

পরীক্ষা ও নিরীক্ষা

সাধারণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এটি মোটামোটি নির্ণয় করা যায়। দাগগুলি অসার কিনা, স্নায়ু প্রান্ত স্ফিত হয়েছে কিনা এগুলি শারীরিক পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে। নিম্নের কিছু পরীক্ষা করে কুষ্ঠরোগের জীবাণুর উপস্থিতি বের করা হয়ে থাকে-

- চামড়া থেকে উপাদান নিয়ে Modified Ziehl-Neelsen Staining এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা।
- লেপ্রমিন পরীক্ষা (Lepromin test) করা।
- চামড়া ও স্নায়ুর Biopsy করা।

চিকিৎসা

কুষ্ঠরোগ নিরাময় করা সম্ভব। সময়মত চিকিৎসা করলে অঙ্গহানি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। এই রোগের জন্য WHO অনুমোদিত চিকিৎসা হল সম্মিলিত ভাবে একাধিক ঔষধের প্রয়োগ (Multidrug Therapy -MDT) করা। এরসঙ্গে ড্যাপসোন (Dapsone) প্রয়োগ করলে এই রোগ নির্মূল করা যায়।

পাউসিব্যাসেলারি লেপ্রসিতে আক্রান্ত কুষ্ঠরোগীরা এই ঔষধ ব্যবহার করলে ৬ মাসের মধ্যে সুস্থ্য হয়ে যায়। মাল্টিব্যাসেলারি লেপ্রসি কুষ্ঠরোগীদের সুস্থ্য হতে অনধিক ১২ মাস লাগে। ঔষধের একটা ডোজ নেওয়ার পর রোগী থেকে সংক্রমণের কোনো ভয় থাকে না। কুষ্ঠরোগী একবার সুস্থ্য হলে আবার রোগাক্রান্ত হবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। WHO র হিসেব অনুযায়ী সময়মত রোগনির্ণয় ও MDT দিয়ে চিকিৎসার ফলে এ পর্যন্ত ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ লোককে পঙ্গুতার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

কুষ্ঠরোগ নির্মূলের ব্যাপারে সফলতা

গত ২০ বছরে ১ কোটি ২০ লক্ষের বেশী কুষ্ঠরোগী রোগমুক্ত হয়েছে। রোগের ব্যাপকতার হার ৯০ শতাংশ কমেছে। ১৯৮৫ সালে যে ১২২ টি দেশে এই রোগটি ছিল, তার ১০৮ টি দেশ থেকেই এটি অদৃশ্য হয়েছে। এখনও বিশ্বের ১৪টি দেশে এ সমস্যা প্রকট আকারে রয়েছে।

প্রস্রাবে রক্ত

প্রস্রাবে রক্তের আভাস দেখা গেলে অনেকেই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হন, তবে প্রস্রাবে রক্ত যেটিকে হেমাচুরিয়া (Hematuria) বলা হয়, সেটি সব সময় ভয়াবহ নয়।

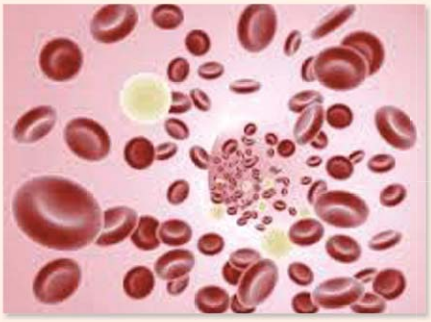

অধিক পরিশ্রমের ফলে বা কিছু কিছু ঔষধ খেলে (যেমন- অ্যাস্পিরিন), এটি দেখা দিতে পারে। বিশ্রাম নিলে বা ঔষধ বন্ধ করলে চিকিৎসা ছাড়াই রক্ত বেরনো বন্ধ হয়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে এর মূলে প্রস্রাবনালীরও কোন কঠিন সমস্যা জড়িত থাকতে পারে।

প্রস্রাবে রক্তের পরিমান খুব অল্প হলে সেটা সাধারণ চোখে ধরা পড়ে না। পরিমান বেশী হলে প্রস্রাবের রঙ গোলাপী, লাল অথবা চায়ের রং ধারণ করতে পারে। একটি সুস্থ মানুষের প্রস্রাবের মধ্যে দিয়ে প্রায় দশ লক্ষ লোহিত রক্ত কণিকা দৈনিক নিঃসৃত হয়। হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে রক্ত প্রস্রাবের মধ্যে দেখা দেওয়ার মূলে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে।

কারণসমূহ

- **মূত্রাশয়ের সংক্রমণঃ** যখন ব্যাক্টেরিয়া মূত্রনালীর মধ্যে দিয়ে মূত্রাশয়ে প্রবেশ করে এবং বংশবৃদ্ধি করে, তখন মূত্রাশয়ে সংক্রমণ হয়। এর ফলে বারবার প্রস্রাব পায়, প্রস্রাব করার সময়ে জ্বালা বা ব্যথা বোধ হয়। প্রস্রাবে দূর্গন্ধ হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রস্রাবে রক্ত দেখা দেয়।
- **বৃক্ক বা কিডনির সংক্রমণঃ** এর উপসর্গও মূত্রশয়ের সংক্রমণের মতো, তবে সেইসঙ্গে জ্বর এবং কোমরের পেছনে ব্যথা হতে পারে।
- **মূত্রাশয় বা বৃক্কে পাথরঃ** কোনও ব্যথা ছাড়া মূত্রাশয় বা বৃক্কে পাথর দীর্ঘদিন যাবত অবস্থান করতে পারে। যখন এটি মূত্রপ্রনালীর কোথাও অবরোধ সৃষ্টি করে বা বেরোবার চেষ্টা করে, তখনই ব্যথা হয়। বৃক্কের পাথর বা কিড্‌নি স্টোন-এ তীব্র ব্যথা হয় এবং যথেষ্ট রক্তক্ষরণ হতে পারে।
- **পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধিঃ** সাধারণত পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই ধরণের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এর ফলে মূত্রনালীতে অবরোধ ঘটে এবং রক্তপাতের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এছাড়া প্রস্টেটের সংক্রমণের ফলেও প্রস্রাবে রক্ত দেখা দিতে পারে।
- **ক্যান্সারঃ** প্রস্রাবের রক্ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৃক্ক, মূত্রাশয় বা প্রস্টেটের ক্যান্সারের জন্য দেখা দেয়।
- **ঔষধের প্রতিক্রিয়াঃ** কোনও কোনও বিশেষ ঔষধের প্রতিক্রিয়ার ফলেও প্রস্রাবে রক্ত দেখা দিতে পারে। এই ঔষধগুলির মধ্যে রয়েছে পেনিসিলিন, অ্যাসপিরিন, হেপারিন, ক্যান্সারের ঔষধ সাইক্লোফসমাইড (সাইটোটক্সিন) ইত্যাদি।
- **বৃক্কে আঘাতঃ** কোনও কারণে বৃক্ক আগাতপ্রাপ্ত হলে প্রস্রাবে রক্ত বেরোতে পারে।

লক্ষণসমূহ

- প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া করা।
- কোমরের পেছনে ব্যথা অনুভব করা।
- প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাওয়া।

পরীক্ষা ও নিরীক্ষা

- মূত্র পরীক্ষা করা। যেমনঃ Urine RME
- রক্ত পরীক্ষা করা। যেমনঃ CBC

- রেনাল ফাংশন টেস্ট। যেমনঃ S. Urea, S. Creatinine, S. Electrolytes এবং 24-hour Urinary protein

- **সিস্টোস্কোপিঃ** একটি ক্ষুদ্র ক্যামেরা মূত্রনালী দিয়ে ঢুকিয়ে মূত্রাশয় ও মূত্রনালীর ভেতরটা ভালো করে পরীক্ষা করা। এই পরীক্ষার মাধ্যমে মূত্রাশয় ও মূত্রণালীর ভেতর কোনও অস্বাভাবিকত্ব আছে কিনা তা দেখা যায়।

- মূত্রপ্রণালীর বিভিন্ন অংশের প্রতিবিম্ব বা ইমেজ দেখা। যেমনঃ Ultrasonogram, CT scan, MRI

চিকিৎসা

রক্তের উৎস নির্ধারণের মাধ্যমে এই রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব।

- **মূত্রনালীর সংক্রমণঃ** মূত্রনালীর সংক্রমণ হলে এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ দেয়া যেতে পারে।

- **বৃক্কে পাথরঃ** বৃক্কে পাথর জমে থাকলে বেশী করে পানি পান করতে হবে। যাতে প্রস্রাবের সঙ্গে সেটা বেরিয়ে যেতে পারে। পাথর না বেরোলে সার্জারির সাহায্যে সেটিকে বের করতে হয় বা অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পাথরটিকে ছোট করে সেটিকে প্রস্রাবের সঙ্গে বের হবার মত অবস্থায় নিয়ে আসতে হবে।

- **প্রস্টেট বড় হলেঃ** অনেক সময়ে ঔষধ ব্যবহার করে প্রস্টেটকে সঙ্কুচিত করা হয়। ঔষধে কাজ না হলে লেজার বা অন্য সার্জারি পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়।

- **ক্যান্সারঃ** মূত্রাশয় ও বৃক্কের ক্ষেত্রে সাধারণত সার্জারির সাহায্যে ক্যান্সার যুক্ত কোষগুলোকে বাদ দিতে হয়, কারণ এই জায়গার কোষগুলো রেডিয়েশন বা কিমোথেরাপি করে সেগুলো নষ্ট করা সহজসাধ্য নয়।

রোটা ভাইরাস

আমাদের চারপাশে বিভিন্ন ধরণের রোগের জীবাণু বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সুযোগ পেলেই এরা আমাদের সংক্রমিত করে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। রোটা ভাইরাস তেমনই এক দুষ্ট জীবাণু যা দেখতে চাকার মত। এই ভাইরাস মারাত্মক এক ডায়রিয়া সৃষ্টি করে যা রোটাভাইরাল ডায়রিয়া নামে পরিচিত। আর এই রোটাভাইরাল ডায়রিয়া সব শিশুদের, বিশেষ করে নবজাতকের জীবনের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। রোটাভাইরাল ডায়রিয়ার কারণে সারা বিশ্বে প্রতিবছর ৬ লাখেরও বেশী শিশু মৃত্যুবরণ করে। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২৪ লক্ষ শিশু রোটা ভাইরাস জনিত পরিপাকতন্ত্রের প্রদাহে ভোগ। প্রতিবছর ৩ লাখেরও বেশী শিশু মারাত্মক সংক্রমণে আক্রান্ত হয়, যার মধ্যে প্রায় অনেক শিশু মৃত্যুবরণ করে।

সংক্রমণ পদ্ধতি

রোটা ভাইরাস প্রধানত মুখ গহবর দিয়ে খাদ্যনালীতে প্রবেশ করে। এই ভাইরাস আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে এবং একজনের কাছে থেকে অন্যজনের দেহে প্রবেশ করে। সংক্রমিত পানি, খাবার, খেলনা এমনকি বিভিন্ন আসবাবপত্র থেকেও এই রোগের জীবাণু ছড়াতে পারে। রোটা ভাইরাস এ সংক্রামণ হওয়ার ২৮ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়।

লক্ষণসমূহ

- প্রথমে শুরু হয় বমি, এরপর ধীরে ধীরে পানির মত পাতলা পায়খানা।

- খুব কম সময়ের মধ্যে ডায়রিয়া তীব্র আকার ধারণ করে এবং ৭ দিন পর্যন্ত ডায়রিয়া থাকতে পারে।

- তীব্র পানি শূন্যতা দেখা যেতে পারে।

- এছাড়া জ্বর এবং পেটের ব্যথাও থাকতে পারে।

চিকিৎসা

পানিশূন্যতা পূরণ করার জন্য ঘন ঘন খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। শিশুর পানিশূন্যতা বেশি হলে এবং মুখে স্যালাইন না খেতে পারলে শিরাপথে স্যালাইন দিয়ে পানিশূন্যতা পূরণ করতে হবে।

প্রতিষেধক

রোটা ভাইরাল ডায়রিয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দুইভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

- প্রথমত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন, শিশু যে সমস্ত জিনিসপত্র ব্যবহার করে সেগুলো সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। শিশু যে সমস্ত খেলনা নিয়ে খেলা করে তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং হাত, এমনকি খাবার তৈরি করার স্থান সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। সর্বোপরি শিশুদের ৬ মাস পর্যন্ত শুধু মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো।
- দ্বিতীয়ত, শিশুকে রোটাভাইরাসের টিকা খাওয়ানো। বর্তমানে প্রতিষেধক হিসাবে রোটা ভাইরাস এর টিকা বাংলাদেশে পাওয়া যায়।

রোটা ভাইরাস এর টিকা

গবেষণায় দেখা গেছে উন্নত জীবনযাত্রা মেনেও অনেক ক্ষেত্রে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায় না। সর্বোপরি ২ মাস থেকে ৬ মাস পর্যন্ত বয়স্ক শিশুদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী থাকে। তাই এই বয়সের শিশুদের রোটাভাইরাল ডায়রিয়া মুখে খাবার স্যালাইন দিয়ে সারিয়ে তোলা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিরাপথে স্যালাইন দিয়ে পানিশূন্যতা পূরণ করতে হয়। তাই এই টিকার বিকল্প নেই। রোটা ভাইরাসের টিকা দিতে হবে দেড় মাস থেকে ছয় মাসের মধ্যে। এই টিকা মুখে খাওয়ানো হয়। প্রথম ডোজ দেয়ার পর দ্বিতীয় ডোজ কমপক্ষে ১ মাস পর দিতে হয়।

এই টিকা দিলে রোটা ভাইরাসের কারণে ডায়রিয়া হবে না। শিশু রোটাভাইরাস জনিত ডায়রিয়ার কারণে মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং শিশুদের জীবন রক্ষার্থে তাদের পরিচর্যার পাশাপাশি রোটা ভাইরাস ডায়রিয়া থেকে পরিত্রাণ পেতে সময়মত টিকা দিয়ে শিশুদের ডায়রিয়া থেকে রক্ষা করা যায়।

ইনফো কুইজ বিজয়ী (জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৩)

Dr. Wai S'ein
RMP
Bisamillah Medical Hall
Taltola Upozilla, Borguna

Dr. Swarna Roy (Uzzal)
RMP
Shaheber Hut, Barisal

Dr. Shohidullah Khandaker
LMF
Khan Pharmacy, Akbar Shah Mazar
Pahartoli, Chittagong

Dr. Arup Kumar Das
RMP
M/S K. N. Pharmacy, Naya Bazar
Chittagong

Dr. M. Abdullah Al Mamun
DMS
M/S Shahida Medical Hall, Suaganj
Bazar, Sadar (South), Comilla

Dr. Md. Abdur Razzak
RMP
M/S Shaba Pharmacy, Bara Haripur
Barua, Comilla

Dr. Billal Hossain
RMP
Tamki Bazar, Muradnagar, Comilla

Dr. Shri Uttam Kumar Das
DMS
Shiber Bazar, Chaudda gram, Comilla

Dr. Md. Miraz
LMF
1 No. Building, Mirpur-14, Dhaka

Dr. Mizanur Rahman
DMF
86, Hasina Banu Market, Rayer Bazar
Dhanmondi, Dhaka

Dr. Nitai Chandra Das
LMAF
M/S. Matry Pharmacy, Shahrail, Singair
Manikganj

Dr. Tarequl Islam
LMF
Satata Pharmacy
35/E, Shymoli, Road No-2, Dhaka

Dr. Payara Alam Shimul
LMAF
Taiyaba Pharmacy, 368/8/11 West
Shewrapara, Dhaka

Dr. Sagir Hossen
LMAF
Suveccha Medical Hall
Darus Slam Tower, Dhaka

Dr. Uzzal Kanti Roy
DMA
Paramedic
Popular Medical Hall
1No. K.B.Road, Dhaka

Dr. B.K. Saha
LMAF
Tarun Medical, Swamibagh, Dhaka

Dr. Md. Rabiul Islam
MSS (ESP)
Sotota Pharmacy, Sorojganj Bazar
Chuadanga

Dr. Jamshed Ali
RMP
Hatboalia, Alamdanga, Chuadanga

Dr. Md. Lokman Hossan
RMP
Mongla, Bagerhat

Dr. Asit Kumar Sarker
RMP
Chitulmir Bazar, Bagerhat

Dr. Samir Kanti Roy
RMP
West Bajua, Dalope, Khulna

Dr. Bimal Kumar Mondal
RMP
Chandipur, Shyamnagar, Satkhira

Dr. Sirajul Islam
RMP, GP
Agorghata Bazar
Paikgacha, Khulna

Dr. Dilip Kumar (Panu)
RMP, GP
Prathomik Chikitsaloy, Shakhari bazar
Thana Road, Laxmipur

Dr. Hedayet Ullah
DMF
SACMO
Sultanpur Sub-center, Brahmmanbaria

Dr. Abdul Basit (Jashim)
DMS
Roisganj Bazar, Bahuball, Hobiganj

Dr. Humayun Kabir
RMP
Sikdar Pharmacy, Nandalalpur, Pagla
Narayanganj

Dr. Md. Abu Kowser
LMF
Charsoboddi Bazar, Raipura, Narshingdi

Dr. Md. Abedul Islam
RMP
Islam Medical Hall, Rangamati Road
Narshingdi

Dr. Chowdhury Ashrafuzzaman
RMP
Keshorhat, Mohonpur, Rajshahi

Dr. Nurul Islam
RMP
Dul sarak, Natore

Dr. Ruhul Amin Rana
LMP
Central Bus Terminal, Rangpur

Dr. Ekramul Haque
RMP
Pawtana Hat, Pirgacha, Rangpur

Dr. Abdul Jobbar
PC
Nageshwari, Kurigram

Dr. Mukteruzzaman
RMP, GP
Maa Pharmacy, Golapganj, Birganj
Dinajpur

Dr. Imran Hossain
LMAF
Tamabil, Gowinghat, Sylhet

ইনফো কুইজ

ইনফো মেডিকাসের সাথে সংযুক্ত বিজনেস রিপলাই পোষ্ট কার্ডের ইনফো কুইজ অংশে সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ডায়াবেটিস কত প্রকার?

ক) ১ প্রকার
খ) ২ প্রকার
গ) ৩ প্রকার
ঘ) ৪ প্রকার

২. টাইপ ১ ডায়াবেটিস এর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?

ক) অগ্ন্যাশয় হতে ইনসুলিন তৈরি হয় না
খ) অগ্ন্যাশয় হতে অল্প পরিমাণ ইনসুলিন তৈরি হয়
গ) অগ্ন্যাশয় হতে নিঃসরিত ইনসুলিন এর কার্যকারিতা হ্রাস পায়
ঘ) অগ্ন্যাশয় হতে ইনসুলিন তৈরি হয়

৩. কাদের ডায়াবেটিস হতে পারে?

ক) যাদের বংশে ডায়াবেটিস নাই
খ) যাদের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা সঠিক পরিমাণে থাকে
গ) যাদের ওজন অনেক বেশী এবং যারা মেদবহুল
ঘ) যারা ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করেন না

৪. ডায়াবেটিস এর লক্ষণ নয় কোনটি?

ক) ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া
খ) খুব বেশী পিপাসা লাগা
গ) যথেষ্ট খাওয়া সত্ত্বেও ওজন কমে যাওয়া
ঘ) ক্ষুধা না লাগা

৫. রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা কত?

ক) < ৬.১ মি.মোল/লি
খ) < ৭.০ মি.মোল/লি
গ) > ৭.০ মি.মোল/লি
ঘ) > ৬.১ মি.মোল/লি

৬. ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ গ্রহন করার ২ ঘণ্টা পর রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা কত?

ক) ৭.৮ - < ১১.১ মি.মোল/লি
খ) > ১১.১ মি.মোল/লি
গ) < ৭.৮ মি.মোল/লি
ঘ) ৬.১ - < ৭.০ মি.মোল/লি

৭. অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের কারণে শরীরের কোন কোন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে?

ক) চোখ
খ) স্নায়ু
গ) কিডনী
ঘ) উপরের সবগুলো

৮. ডায়াবেটিস চিকিৎসার মূল উপাদানগুলো কি কি?

ক) শিক্ষা
খ) সঠিক খাদ্যাভাস
গ) ব্যায়াম
ঘ) উপরের সবগুলো

৯. ইনসুলিন কত প্রকার হতে পারে?

ক) ১ প্রকার
খ) ২ প্রকার
গ) ৩ প্রকার
ঘ) ৪ প্রকার

১০. ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে কি কি ধরনের জীবন যাত্রার পরিবর্তন আবশ্যক?

ক) ডায়াবেটিক রোগীদের সুস্থতার জন্য খাদ্যাভাস নিয়ন্ত্রণ
খ) ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা
গ) ব্যায়াম না করা
ঘ) ধূমপান ও মাদকাসক্তি থেকে বিরত থাকা

ইনফো কুইজ সংক্রান্ত তথ্য

উত্তর দেবার পর বিজনেস রিপলাই পোষ্ট কার্ডটি আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধির নিকট ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ ইং এর পূর্বে হস্তান্তর করুন। আপনার সহযোগীতা আমাদের একান্ত কাম্য।

এসিআই লিমিটেড